লোক প্রশাসন সাময়িকী
দ্বাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ৯৮, আশ্বিন ১৪০৫

বাংলাদেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা

আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান *

১.০ ভূমিকা

ন্যায়পাল বা Ombudsman বিষয়ক ধারণাটি এদেশের জনগণের নিকট এখনও তেমন সুপরিচিত হয়ে ওঠেনি। অনেকেরই এ সম্পর্কে ভাসাভাসা বা সীমিত জ্ঞান রয়েছে। দেশের কোনো কোনো রাজনীতিবিদের এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকলেও গোষ্ঠী স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাঁরা এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে ততটা উৎসাহী নন। প্রায় একই অবস্থা দৃষ্ট হয় প্রতিটি সরকারের আমলে। অথচ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এই প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব ও কার্যকারিতা অপরিসীম। বহুবিধ প্রশাসনিক সমস্যা এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব এবং সু-সরকার প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

২.০ ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও বাংলাদেশে ন্যায়পাল আইন

ন্যায়পাল সম্পর্কে সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে Geard E. Laiden বলেন "The institutional public conscience, the essence of what government ought to do." অনেকে একে আইন বিভাগের একটি 'স্বাধীন বাহু' রূপে আখ্যায়িত করেছেন, যা সরকারী সংস্থা ও কর্মচারীবৃন্দকে আইন বিভাগের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এসব মতামত থেকে সহজেই অনুমেয় যে, যে কোন প্রকার সরকারী অবিচার, অনাচার, বিচারহীনতা, দুর্নীতি, অসদাচারণ, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, নীতিহীনতা ও অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্যই ন্যায়পাল নামক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও বজায় রাখা হয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহে দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অনাচার উন্নত দেশসমূহের তুলনায় প্রায়শই বেশী পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। এর প্রতিবিধানে সরকারের অক্ষমতার কারণ প্রধানত দু'টি। প্রথমটি হলো জনপ্রিয়তা হারানোর ভয় এবং ভবিষ্যতে সরকার গঠনে সমর্থ না হওয়ার দুশ্চিন্তা এবং দ্বিতীয়টি হলো দলীয় সদস্যদের বিচার

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

করার ক্ষমতা ও মানসিকতার অভাব। যেহেতু সরকারের নিজ দলীয় সদস্যদের ক্ষেত্রে ক্ষমা ও ঔদার্য অধিক পরিমাণে প্রদর্শিত হয়, ফলে অন্য দলীয় সদস্যদের দুর্নীতির প্রতিবিধানেও সরকার নৈতিক মনোবল হারিয়ে ফেলে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের এই সমস্যার সমাধানে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠানই সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কিন্তু উপর্যুক্ত কারণে কোন সরকারের নিকটই এই প্রতিষ্ঠানটি খুব একটা বরণীয় ও আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠেনা।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, "৭৭(১)-সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পাল পদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করতে পারবেন। (২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন। (৩) ন্যায়পাল তাঁর দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হবে।"

১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের পরে ২৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ৭টি নির্বাচিত সরকারও গঠিত হয়েছে, কেবল ন্যায়পাল নামক প্রতিষ্ঠানটি এখনও বলবৎ করা হয়নি।

১৯৮০ সালে তৎকালীন সংসদে ন্যায়পাল বিল পাস হয় এবং তাকে "ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সালের ১৫নং আইন)" নামে অভিহিত করা হয়। আইনে উল্লেখ করা ছিল যে, যেদিন থেকে গেজেটে এই আইনটি প্রকাশিত হবে, সেদিন থেকে এটিকে কার্যকর বলে গণ্য করা হবে। এরপরে অতিবাহিত হয়েছে ১৮টি বছর, আজও গেজেটে সেই আইন প্রকাশিত হয়নি এবং সঙ্গত কারণে তা কার্যকরও হয়নি। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, সকল সরকারের নিকটই আইনটি সুখকর বা শুভকর বিবেচিত হয়নি, তাই অপাঙক্তেয় হয়ে পড়ে আছে তা জাতীয় সংসদের ধুলি ধূসরিত নথির মধ্যে দেড়যুগ ধরে।

৩.০ ন্যায়পাল প্রয়োজন কেন?

একটি দেশে দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ সরকার পরিচালনার জন্য ন্যায়পালের প্রয়োজন। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক দেশসমূহে প্রধানত তিনটি বিভাগ কার্যকর থাকে, যথা ঃ আইন বিভাগ, নির্বাহী বা শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। আইন বিভাগ বলতে জন প্রতিনিধি তথা সংসদ সদস্যবৃন্দকে বুঝানো হয়। আইন বিভাগ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং প্রযোজনবোধে প্রচলিত আইনকে যুগোপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমার্জন সাধন করে থাকে অথবা বাতিল/রহিত করে।

নির্বাহী বা শাসন বিভাগকেই 'সরকার' বলে চিহ্নিত করা হয়, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে মনোনীত প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রি-পরিষদ দ্বারা গঠিত এবং সংবিধান এবং আইন বিভাগের প্রণীত ও দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে। এই নির্বাহী বা শাসন বিভাগের নির্দেশ এবং সংসদে প্রণীত বিধি বিধান অনুযায়ী দেশের সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ কাজ করে থাকেন এবং এদেরকে নির্বাহী বা শাসন বিভাগের সহায়ক শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। 'সরকার' বলতে তাই মন্ত্রি পরিষদ সহ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বুঝানো হয়ে থাকে। সার্বিকভাবে মন্ত্রি-পরিষদ ও সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী 'সরকার' হিসেবে গণ্য এবং 'সু সরকার', 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার' প্রভৃতি প্রত্যয়সমূহ এই নির্বাহী বা শাসন বিভাগের জন্যই প্রযোজ্য হয়। এই বিভাগ সাংবিধানিকভাবে আইন বিভাগের নিকট জবাবদিহিতার জন্য দায়বদ্ধ।

রাষ্ট্রের অপর বিভাগটি বিচার বিভাগ নামে পরিচিত। রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সকল বিভাগের প্রভাব মুক্ত থাকা এর বৈশিষ্ট্য। এই বিভাগের নিকট সরকার এবং দেশের নাগরিক যে কোন ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করতে পারে। বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিসহ তাঁর অধীনস্থ সকল বিচারালয় ও বিচারপতিবৃন্দ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। দেশের যে কোন নাগরিক বঞ্চিত বা সংক্ষুব্ধ হলে অপর কোন নাগরিক বা সরকার অথবা সরকারের অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্যের বিরুদ্ধে দেশের বিদ্যমান ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যবিধি মতে বিচার বিভাগের নিকট বিচার প্রার্থনা করতে পারেন। তেমনি সরকারও যে কোন নাগরিকের অপরাধের বিচার এই বিভাগের নিকট চাইতে পারে। এছাড়াও বিচার বিভাগের প্রত্যেক বিচারপতির 'স্যুয়োমটো' (সংঘটিত কোন অপরাধকে নিজ উদ্যোগে আমলে এনে বিচার করার ক্ষমতা) ক্ষমতা রয়েছে।

এখন পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে যে, একটি দেশে স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং আইন বিভাগ তথা সংসদ বিদ্যমান থাকার পরেও দেশের নির্বাহী বিভাগ তথা সরকারের সকল প্রকার দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, শৈথিল্য, বিচারহীনতা, অন্যায় প্রভৃতি দূরীভূত করে মানবাধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার ও সু সরকার (Good Governance) প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়না কেন?

প্রথমে বিচার বিভাগের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা যাক। দেশের বিচার বিভাগকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার কার্য নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত থাকতে হয় যে, স্যুয়োমটো ক্ষমতা প্রয়োগের ইচ্ছে থাকলেও সময়ের অভাবে তা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়না। তাছাড়া, অধিষ্টিত সরকারের সহযোগিতার অভাব এবং প্রমাণাদি সরবরাহে অনীহা অনেক ক্ষেত্রে জড়িত থাকে, যার ফলে বিচারকার্য বাধার

সম্মুখীন হয়। তাই অতীতে ১৯৭৫ সালে সপরিবারে দেশের প্রেসিডেন্ট হত্যা এবং ১৯৮০সালে পুনরায় প্রেসিডেন্ট হত্যার ক্ষেত্রে দেশের বিচার বিভাগ স্যুয়োমটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিচারের ব্যবস্থা করেনি। দেওয়ানী বিচার প্রার্থনায় নির্দিষ্ট পরিমাণ কোর্ট ফি জমা দিতে হয়। খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্থ না হলে কোন নাগরিক তার বিপুল অর্থ ব্যয় করে সরকারের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের দ্বারস্থ হবে, এটি সচরাচর দৃষ্ট হয়না। কিন্তু যদি বিনা ব্যয়ে এরূপ দুর্নীতির অভিযোগ করা যায়, যেমনটা ন্যায়পালের নিকট করা যাবে, তাহলে অনেক নাগরিকই তা করতে চাইবে

আইন বিভাগ তথা সংসদে যে কোন সংসদ সদস্য সরকারের কার্যক্রম ও ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। প্রশ্ন করার নির্ধারিত পদ্ধতি আছে এবং তা সকল সদস্যের জন্যই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এতে শাসন বিভাগের সদস্য (মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রিবৃন্দ) উত্তর দিতে বাধ্য থাকেন। এছাড়া রয়েছে সংসদীয় কমিটিসমূহ, যেখানে প্রায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের পালা চলে। বর্তমান সরকারের আমলে প্রতিটি সংসদীয় কমিটির প্রধান একজন সংসদ সদস্য, তিনি সরকারী বা বিরোধী যে কোন দলেরই হোন না কেন। পূর্বে এ নিয়ম ছিলনা। তখন কেবল সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিবৃন্দই সংসদীয় কমিটির প্রধান নিযুক্ত হতেন।

সংসদের প্রশ্নোত্তর এবং সংসদীয় কমিটির পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কার্যক্রমের জবাবদিহি সম্পূর্ণ হওয়ার কথা এবং বাহ্যত কোন প্রকার দুর্নীতি ও অবিচার থাকার অবকাশ থাকেনা। কিন্তু এত কিছুর পরেও শাসন বিভাগের বহু বিষয়ে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়না। একে তো সরকারের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও ভোটাধিক্যের ফলে বিরোধী দলের বহু ফরিয়াদের ভাগ্যে "না জয়যুক্ত হয়েছে" প্রাপ্তি ঘটে। তাছাড়া, সংসদীয় কমিটির প্রদত্ত তথ্যে কোন কিছু গোপন করা হলে তা উদ্‌ঘাটনের পথ বিরোধীদলের জন্য খুব বেশী খোলা থাকেনা। অনেক সময় সংসদীয় কমিটি যে কাজটি 'অবিলম্বে করতে হবে' বলে সিদ্ধান্ত নেয়, সেটি বহুদিন যাবত প্রলম্বিত হতে থাকে–জনগণের দুর্দশার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

ফলে দেখা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে আইন ও সংসদ, সংসদীয় কমিটি এবং বিচার বিভাগ দ্বারা বহু দুর্নীতি, শৈথিল্য, স্বজনপ্রীতি, অবিচার ও বিচারহীনতা রোধ করা বাস্তবে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে এমন একজন নিরপেক্ষ ও কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি যদি থাকেন, যাঁকে দলীয় প্রীতি ও নির্বাচনের তোয়াক্কা করতে হবেনা এবং যিনি সকল প্রকার দুর্নীতি ও অবিচারের বিরুদ্ধে

গ্রন্থাগার সাময়িকী শাখা তারিখ .. সাভার, ঢাকা

স্যুয়োমটো ক্ষমতায় ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, তাহলে শাসন বিভাগের দুর্নীতি, অবিচার ও শৈথিল্য হ্রাস পেতে পারে। এমন একজন নিরপেক্ষ ও কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিকেই বলা হয় ন্যায়পাল। আমাদের দেশে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান' যেমন কোন দলীয় ব্যক্তি নন এবং নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব পালনে প্রশংসিত হন, ঠিক তেমনিভাবে একজন ন্যায়পাল তাঁর নিরপেক্ষ ভাবধারায় কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন। ন্যায়পাল কেবল সরকারের নয়, বরঞ্চ দেশের যে কোন ব্যক্তির আইনভঙ্গ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমাজ ও দেশকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে সচেষ্ট হন।

৪.০ পৃথিবীর বিভিন্নদেশে ন্যায়পালের অবস্থান ও প্রকৃতি

ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠানের পথিকৃৎ রাষ্ট্র সুইডেন। ১৮০৯ সালে সুইডেনে ন্যায়পাল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সে সময় থেকে সুইডেনে যে কোন ব্যক্তি ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা তাঁর উপর অবিচার করা হয়েছে এরূপ অবস্থায় ন্যায়পালের নিকট অভিযোগ করে থাকেন। ন্যায়পাল তার অভিযোগ তদন্ত করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। সে দেশের পার্লামেন্ট যদিও ন্যায়পালকে নির্বাচিত করে, কিন্তু ন্যায়পালকে কোন নির্দেশ দিতে পারেনা। ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত ন্যায়পাল বছরান্তে তাঁর কার্যক্রমের রিপোর্ট পার্লামেন্টে দাখিল করেন। তবে গুরুতর অপরাধ বা অসদাচারণের জন্য পার্লামেন্টের নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের ভোটে ন্যায়পালকে বরখাস্ত করা যেতে পারে।

১৯১৯ সালে ফিনল্যান্ডে, ১৯৫৫ সালে ডেনমার্কে এবং ১৯৬৩সালে নরওয়েতে ন্যায়পাল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফিনল্যান্ডে সুইডেনের মত ৪ বছরের জন্য ন্যায়পালকে নির্বাচিত করা হয়। ডেনমার্ক ও নরওয়েতে প্রত্যেক সংসদ নির্বাচনের পরে ন্যায়পাল নিযুক্ত হয় এবং পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত তাঁর মেয়াদ বলবৎ থাকে। একই ন্যায়পাল পুনরায় নির্বাচিত হতে পারে। সাধারণত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, প্রখ্যাত আইনজীবী, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রভৃতির মধ্য থেকেই ন্যায়পাল নির্বাচিত করা হয়। প্রতি বছর ন্যায়পালকে তাঁর কার্যক্রমের রিপোর্ট পার্লামেন্টে দাখিল করতে হয়, তবে পার্লামেন্ট তাঁকে কোন নির্দেশ দিতে পারেনা। দেশভেদে ন্যায়পালের কার্যক্রমের পরিধির পার্থক্য রয়েছে। যেমন ফিনল্যান্ডের ন্যায়পাল কোন সংসদ সদস্য, চ্যান্সেলর অব জাস্টিস এবং রাষ্ট্রপতির কার্যক্রমের উপর তদারকী করার অধিকার রাখেন না। অন্যদিকে সুইডেনের ন্যায়পাল সামরিক বাহিনীর কার্যক্রমের ত্রুটি-বিচ্যুতিও তদারক করে থাকেন।

ন্যায়পাল ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, ন্যায়পাল নিজে থেকে কোন অবিচার বা দুর্নীতি আমলে নিতে পারেন (স্যুয়োমটো), কিংবা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়েরকৃত অভিযোগ গ্রহণ করতে পারেন। অতঃপর ন্যায়পাল তাঁর দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা তদন্ত করতে পারেন এবং অভিযোগ সত্য হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান (অভিযুক্ত) কে এর সমাধানের নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু নিজে কোন শাস্তি বলবৎ করেননা।

১৯৬০ এর দশকে Ombudsman তথা 'ন্যায়পালে'র ধারণাটি পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হয়ে পড়ে। ফলে দেখা যায় যে, ১৯৬২ সালে নিউজিল্যান্ডে, ১৯৬৭ সালে যুক্তরাজ্য ও কানাডায়, ১৯৬৮ সালে তানজানিয়ায়, ১৯৭১ সালে ইসরাইলে, ১৯৭৩ সালেফ্রান্সে, ১৯৭৫ সালে পর্তুগালে, ১৯৭৭সালে অষ্ট্রেলিয়া, অষ্ট্রিয়া ও পেত্রোরিকায়, ১৯৮১সালে নেদারল্যান্ডে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩ সালে একযোগে ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে (আর্জেন্টিনা, কোস্টারিকা, কলোম্বিয়া, গুয়েতেমালা, পেরু), অফ্রিকার বিভিন্ন দেশে (নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে (পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, লিথুয়ানিয়া, স্লোভানিয়া) ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়ার ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপিন্সও পাকিস্তান ন্যায়পাল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে বিশ্বের ৭৫টিরও বেশী দেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান কার্যকর রয়েছে।

ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠানকে আরও অর্থবহ ও সুসংহত করে তোলার জন্য ১৯৭৮ সালে "ইন্টারন্যাশনাল ওমবুডস্ম্যান ইনষ্টিটিউটি' সংক্ষেপে 'আই ও আই' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীকে ৬টি অঞ্চলে ভাগ করে 'আই ও আই' এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অঞ্চলগুলো হলো ঃ (১)এশিয়া (২) ইউরোপ (৩) আফ্রিকা (৪) উত্তর আমেরিকা (৫) ক্যারিবিয়ান-ল্যাটিন আমেরিকা (৬) অষ্ট্রেলিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চল। 'আই ও আই'এর কার্যক্রম হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারকরণ এবং বিভিন্ন দেশের ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়করণ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ন্যায়পালকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন ঃ স্পেন, আর্জেন্টিনা ও কলোম্বিয়ায় 'ডিফেন্সর দেল পুয়েবলো' শ্রীলংকা ও যুক্তরাজ্যে 'পার্লামেন্টারী কমিশনার ফর এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন' ফ্রান্স, গ্যাবন ও মৌরিতানিয়ায় 'দেলা রিপাবলিকি' দক্ষিণ আফ্রিকায় 'প্রটেক্টর' নাইজিরিয়ায় 'পাবলিক কমপ্লেইনটস্ কমিশন' ইটালিতে 'ডিফেন্সর সিভিকো' পাকিস্তানে 'ওয়াকাফি মোহতাসিব' এবং ভারতে 'লোকপাল'।

৫.০ বাংলাদেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

১৯৮০ সালের দিকে বাংলাদেশে কতিপয় ক্ষেত্রে দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করে অথচ প্রমাণাভাবে অথবা দলীয় কারণে এর প্রতিবিধান করা সম্ভব হচ্ছিলনা, সে সময়েই ন্যায়পাল আইনটি সংসদে পাশ হয়। পরে রাজনীতিবিদদের গোষ্ঠী স্বার্থের এবং সামরিক শাসনের ফলে তা আর গেজেটে প্রকাশিত হয়ে কার্যকর হতে পারেনি। অতঃপর ১৯৯১ সাল ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের অস্থায়ী সরকারের আমলে দেশের প্রধান প্রধান সমস্যাবলী চিহ্নিত করার জন্য যে ২৯টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়, তারমধ্যে সরকারের অপকর্ম, (Government Malpractice) সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টে দেশে দুর্নীতি দূরীকরণ এবং প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষে 'ন্যায়পাল' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ-কল্পে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সেই রিপোর্টে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১৯৯৩ সালে ইউ এন ডি পি (ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম্স) কর্তৃক বাংলাদেশের 'লোক-প্রশাসন সেক্টর সমীক্ষা' রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, "...(৫) সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ন্যায়পালের ধারণার কথা সংবিধানে উল্লিখিত থাকলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের নালিশ শোনা ও বিচার বিবেচনা করার জন্য কিছুটা তৈরী পদ্ধতি থাকা জরুরী।"...

উপর্যুক্ত রিপোর্টসমূহ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দেশে বিরাজমান গণতন্ত্র নস্যাৎকারী সামরিক শাসনসহ সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম, অদক্ষতা, বিচারহীনতা, কাজে দীর্ঘসূত্রিতা ও শৃঙ্খলার অভাব দূরীকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে হয়তো সাময়িকভাবে কোন সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের জনগণের কল্যাণ হবে।

এখানে দু'একটি ক্ষেত্রের অবস্থা উল্লেখ করে ন্যায়পাল নিয়োগের প্রয়োজনীয়তাকে কিছুটা স্বচ্ছ করার প্রয়াস নেয়া যেতে পারে। বাংলাদেশে ঋণ খেলাপীদের তালিকা যথেষ্ঠ দীর্ঘ। এদের অধিকাংশই সমাজের উচ্চ স্তরে আসীন এবং ভাগ্যের বরপুত্র। এদের বিরুদ্ধে জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে দেশ আর্থিক দুর্দশা মুক্ত হতে পারে এবং উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদ জোগান দেয়ার পথ উন্মুক্ত হতে পারে। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ যে কোন সরকারের জন্য অত্যন্ত

ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কারণ, এদের প্রদত্ত চাঁদায় বহু রাজনৈতিক দল পরিচালিত হয় এবং যে কোন সরকারের জনপ্রিয়তায় ধ্বস নামাতে এরা ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী। তাই সব সরকারই প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করে, বাস্তবে প্রতিকার মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কারা সন্ত্রাসী, কাদের নিকট কোন্ অস্ত্র কত পরিমাণে আছে, তা সব সরকারেরই জানার কথা কিন্তু অজ্ঞাত (?) কারণে এই অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসী গ্রেফতার এবং কলুষ মুক্ত শিক্ষাঙ্গণ সৃষ্টিতে তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। চাঁদাবাজী চলছে অলিতে গলিতে, অনেকটা প্রকাশ্যেই। কিন্তু তারা যেহেতু কোন না কোন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় রয়েছে, তাই জনগণের মুক্তির ব্যবস্থায় কেউ এগিয়ে আসেনা। বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের উত্তম ও লোভনীয় (?) পোষ্টিংয়ের জন্য রেট ধার্য্য করা আছে বলে দৈনিক পত্রিকায় খবর বেরোয়, কিন্তু বিচার বিভাগের স্যুয়োমটো ক্ষমতা দ্বারা এর নিবারণ বা প্রতিকার হয়না।

এক্ষেত্রে ন্যায়পাল কর্তৃক ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণে কোন অসুবিধা হতো না। কারণ, তিনি তো পদপ্রার্থী হননি, তাঁকে পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত বা মনোনীত করা হয়েছে। পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার দুশ্চিন্তা এবং তাঁর জনপ্রিয়তা ধরে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি অনায়াসে এসব সমস্যার সমাধান করে দেশকে রাহুমুক্ত করতে পারতেন। যেসব ব্যক্তি সরকারের রোষাণলে পড়ে অবিচারের শিকার হয়, তারা অন্তত একটি আশ্রয়ে নির্ভয়ে গিয়ে বিনা কোর্টফিতে বিচার প্রার্থনা করতে পারতো। আর এভাবেই এই অযুত দুঃখের দেশে "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদতো না।"

৭.০ উপসংহার

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাগণ বহু আগেই ন্যায়পাল নামক প্রতিষ্ঠানটির কথা চিন্তা করেছিলেন এবং সংবিধানে ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান করার অবকাশ রেখেছিলেন। উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতির অবকাশ থেকে যায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তার কিছুটা নিরাময়ের আশা নিহিত থাকে একজন আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বশালী নিরপেক্ষ ব্যক্তির আশ্রয়ে। ১৯৯০-৯১ সালের নিরপেক্ষ অস্থায়ী সরকার এবং ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষপাতহীন শাসন ও বিচারে এদেশের জনগণ দুর্নীতিমুক্ত দু'টি নির্বাচন প্রত্যক্ষ করে লোভাতুর হয়ে বুভুক্ষের মত চেয়ে আছে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠানের মত অরাজনৈতিক ও সহজগম্য একটি আশ্রয়ের প্রতি। ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ফল্গুধারাসহ একটি সু-সরকার প্রতিষ্ঠায় তাদের আশা উচ্চাভিলাসী হতে পারে কিন্তু অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা নয়।

১৯৮০ সালের ১৫ নম্বর আইন "ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০" সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিমার্জন প্রয়োজনীয় হলে পুনরায় সংসদে উত্থানপূর্বক তা সম্পূর্ণ করে গেজেটে প্রকাশ করা যেতে পারে। এই আইন কার্যকর হলে বাংলাদেশের দুঃখী জনগণ ৫ বছর পর পর একটি করে নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারই কেবল লাভ করবে না, প্রতিটি মুহূর্তের জন্য একজন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় অভিভাবকও লাভ করবে। প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার দ্বার উন্মোচনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে অরাজনৈতিক ব্যক্তিরাই কেবল লাভবান হবে এমনটি নয়, বরঞ্চ প্রকৃত লাভবান হবে রাজনৈতিক দলগুলিই। ইতিহাস তখন তাদেরকেই স্মরণ করবে।

উল্লেখ্য, বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮, দেশের জাতীয় সংসদের "ইনষ্টিটিউট অব পার্লামেন্টারী স্টাডিজ (আই পি এস)" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা সংসদীয় গণতন্ত্রকে কার্যকর ও অর্থবহ করে তুলতে এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের যথাযথ ভূমিকা পালনে দক্ষ হতে সহায়তা করবে। আই পি এস উদ্বোধনকালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শীঘ্রই ন্যায়পাল আইন বলবৎকরণ এবং ন্যায়পাল নিযুক্তির আশ্বাস দিয়েছেন। এই আশ্বাস কার্যে পরিণত হলে দেশ একজন ন্যায়দন্ডধারী অভিভাবকরূপে ন্যায়পাল লাভ করে 'সু-সরকার' প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগামী হবে এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে অগ্র সৈনিক হিসেবে বিবেচিত হবেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Ahmed. Ali. (1993). *Ombudsman for Bangladesh.* Academic Publishers. Dhaka. Bangladesh.

২। Gellhorn. walter (1966). *Ombudsman and Others.* Harvard University Press. Massachusetts. USA

৩। *গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (১৯৭২), বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৪। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (১৯৯৩), *বাংলাদেশ লোক প্রশাসন সেক্টর সমীক্ষা রিপোর্ট।* (জুলাই, ১৯৯৩)

৫। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১৯৯২), *'প্রশাসনে স্বচ্ছতা'* (সেমিনার প্রতিবেদন, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯২), সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৬। *Report of the Task forces on Bangladesh Development Strategies for the 1990S.* (Vol. 2) University Press limited. Dhaka. Bangladesh.

৭। আহমদ, জামাল উদ্দিন (১৯৯৫), *প্রশাসনে জবাবদিহিতা ঃ ন্যায়পালের ভূমিকা (বাংলাদেশ প্রেক্ষিত)।* (সেমিনার প্রতিবেদন, ২৪তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স, অক্টোবর, ১৯৯৫), লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৮। Muslim. Syed Naquib. *"Office of Ombudsman Can Promote Accountability"* The Daily Star. 17/06/1993. Dhaka.